দৈনিক সংবাদে

তারিখ 28 FEB 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

CIE

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

সংবাদ

ঢাকা : মঙ্গলবার, ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৯৫

একটি স্বল্পায়ু প্রকল্প

সরকার মাধ্যমিক পর্যায়ে বৃত্তিমূলক বিষয় চালু করা এবং গ্রামের বেকার লোকদের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য একটি প্রকল্প হাতে নেয়। এর অধীনে ৩২ কোটি টাকা ব্যয়ের একটি কমিউনিটি স্কুল প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ে বৃত্তিমূলক বিষয়ে শিক্ষাদানের পাশাপাশি ১৮৬টি উপজেলায় একটি বালক ও একটি বালিকা বিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট করে একটি বালক ও একটি বালিকা কমিউনিটি স্কুল এবং ১২টি উপজেলায় ১২টি সহ-শিক্ষা কমিউনিটি স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এই প্রকল্পের অধীনে।

এখন জানা গেল, এই প্রকল্প শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এ যাবৎ এই প্রকল্পে বহু অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছিল ১৯৮১ সালে। মাধ্যমিক পর্যায়ে নবম শ্রেণীতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয় ১৯৮৭ সালে।

কমিউনিটি স্কুল প্রকল্প অনুযায়ী ট্রেডে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ৮শ' শিক্ষক নিয়োগ করা হয় এবং তাদের চাকুরির মেয়াদ ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্প চলার সময় তাদের ৫শ' থেকে এক হাজার টাকা অনুদান দেয়া হত, এর পর তাদের মাধ্যমিক স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসাবে আত্তীকরণ করে নেয়া হয় আরও দু'বছর পরে। কমিউনিটি স্কুল বন্ধ করে দেয়া হয়।

কিন্তু গত জুলাই মাস থেকে এসব শিক্ষক কোন বেতন পাচ্ছেন না। বাধ্য হয়ে সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ নবম শ্রেণীতে ট্রেড বিষয়সমূহে শিক্ষা প্রদান বন্ধ করে দিয়েছেন।

ফলে ৮০০ ট্রেড শিক্ষক বেকার হয়েছেন আর কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিষয় নিয়ে এস এস সি পরীক্ষার্থীদের মাথায় বাজ পড়েছে।

দেখা গেল কেরানী তৈরীর কারখানার পরিবর্তে শ্রমিক তৈরীর কারখানার প্রলেপ লাগানোর একটা সাধু উদ্যোগ চালিয়ে যাওয়া সরকারের সাধ্যে কুলালো না শেষ পর্যন্ত।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, মাসখানেকও হয়নি, শিক্ষা সপ্তাহ খুব জমজমাট করে পালন করা হল। চমৎকার সব প্রবন্ধ পড়া হল। ততোধিক জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিলেন কর্তাব্যক্তিরা। শিক্ষার রোশনাই ছড়িয়ে দেয়ার সংকল্প নিয়ে শিক্ষা সপ্তাহ শেষ হল। সেখানে এমন কথাও বলা হয়েছিল যে, স্কুলে প্রাপ্ত শিক্ষা কর্মসংস্থানের উপযোগী নয়। জীবনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার পক্ষে অনুপযুক্ত এই শিক্ষা ব্যবস্থা বদলাতে হবে।

তার একটা ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা শুরু করা হয়েছিল ১৯৮১ সালে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা নিয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণরা বেরিয়ে আসবে কমিউনিটি স্কুল থেকে, বেরিয়ে আসবে মাধ্যমিক স্কুল থেকেও। এখন দেখা গেল মাধ্যমিক পর্যায়ে সেই পাঠক্রম বাদ দেয়া হল। কোন ব্যাখ্যা নেই কেন বাদ পড়ল এই পাঠক্রম। এরা প্রশিক্ষণ পেয়ে বেরিয়ে আসলেই কাজ করার সুযোগ পেত এমন ধরনের মনে করার অবশ্য কারণ নেই। আরও উচ্চপর্যায়ে কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আছে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রী এবং ডিপ্লোমাপ্রাপ্তদের একটা বড় অংশের কর্মসংস্থান হয় না, তারা বেকার থাকে, সেখানে হাজারে হাজারে ট্রেড বিষয়ক ছাত্ররা পরীক্ষা পাস করে কাজ পাবে এমন সুযোগ তো সৃষ্টি করা হয়নি। তবুও একটি উপযুক্ত শিক্ষা নিয়ে ছাত্ররা বেরিয়ে আসবে, এটা কম ভরসার কথা নয়।

অবশ্য কমিউনিটি স্কুলে কাঠের কাজ, বিদ্যুতের কাজ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হলেই কর্মসংস্থান নিশ্চিত হবে—এমন মনে করা যেমন ভুল, ~~তেমনি এ ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন নেই তাও মনে করা ঠিক নয়।~~ শিক্ষাকে কর্মজীবনে প্রবেশের উপযোগী হতে হবে, এ দাবী তো দীর্ঘকালের।

তাই সরকারী এই উদ্যোগ সবদিক ভেবে-চিন্তে করা না হলেও এর একটা ইতিবাচক দিক ছিল। শিক্ষাকে নৈর্ব্যক্তিকতা থেকে মুক্ত করে কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করার মানসিকতা এ দ্বারা উৎসাহ পেয়েছিল। শিক্ষার সঙ্গে কর্মসংস্থানের সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা শুরু হয়েছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রকল্পটি মাঝপথে বন্ধ করে দেয়ায় এতদিন যারা এধরনের শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী ছিল এবং সংসার সমরাঙ্গনে কিছুটা হাতিয়ারসজ্জিত হয়ে জীবিকাযুদ্ধে নামার ভরসা করছিল, তাদের হাতিয়ার কেড়ে নেয়া হল। ফিরে যেতে হল সেই শিক্ষার মূল স্রোতে যাকে উঠতে-বসতে সকলেই কোন না কোন দিক দিয়ে সমালোচনা করে থাকেন। কিন্তু আসন্ন এস এস সি পরীক্ষার্থীরা কি করবে? তাদের ভাগ্য আজ অনিশ্চিত। কপালে দুশ্চিন্তার রেখা।

শিক্ষা জীবন শেষ করে সবাই চাকরি পান না কিংবা কর্মসংস্থান করতে পারেন না : তবুও চেষ্টা করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে বেশ কিছু ছাত্র পরীক্ষা দিতে গিয়ে হিমশিম খাবে। কারণ কারিগরি বিষয়টি বাদ পড়েছে। দু'বছর ধরে প্রাণপণে হাতেকলমে কাজ শিখে তারা এখন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে না। তার বদলে অন্য বিষয় পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়ার সময় হাতে নেই। তারা এখন কি করবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বলে দেয়া উচিত।

একটি প্রকল্প সরকার হাতে নিলেন। কোটি কোটি টাকা খরচ হল, তারপর দেখা গেল আর টাকা যোগানোর ক্ষমতা সরকারের নেই, সুতরাং চুপচাপ সরে পড়েছেন সরকার। কোনরূপ কৈফিয়ত নেই, ব্যাখ্যা নেই। শিক্ষকরা যখন মাসের পর মাস বেতন পেলেন না, তখন খোঁজ পড়ল প্রকল্পটার গতি কী হল।

না ভেবে-চিন্তে একটা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। খুব প্রচার করা হয়। কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে ভাষণে ও বাহবায় জনসভা উদ্বেল হয়। আর যখন প্রকল্প বন্ধ করে দেয়া হয় কিংবা অঘোষিতভাবে বন্ধ থাকে, ভুক্তভোগীরা উদ্বিগ্ন হন। কেউ চাকরি হারিয়ে আবার বেকার। প্রকল্প যাদের জন্য করা, তারাও ভাবেনি এ প্রকল্প একদিন তাদের বিনা নোটিশে পথে বসাবে।

সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে নিত্যনতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেন। তার অনেকটা কোন বাস্তব সমস্যার সমাধান দেয় না। যেটা কিছুটা হলেও দিবে বলে সকলে কম-বেশী আশা করেছিল, সেটাই সরকার বন্ধ করে দিলেন। এটা সরকারই চালু করেছিলেন এই যুক্তি দেখিয়ে যে, এর প্রয়োজন আছে। এই প্রকল্পের যুক্তিটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে তর্ক ছিল না! অথচ যেসব বিষয় নিয়ে তর্ক উঠতে পারে এবং ওঠে সেটা সরকার জোরেশোরে আঁকড়ে ধরেন। আর যে বিষয়ে কখনও কেউ বিরোধিতা করেনি, সেটাই অঘোষিতভাবে বন্ধ করে দেয়া হল। কোন কারণ দেখানোর প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করেনি সরকার। শিক্ষা নিয়ে এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুধু টাকার অপচয় নয়, শিক্ষা সম্পর্কে সরকারের যে মনোভাবের প্রতিফলন বেরিয়ে আসে, সেটা খুব প্রশংসনীয় নয়। এ কথাটা মনে রেখে শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্ততঃ স্থিতিশীলতা বজায় থাকে সেটুকুর প্রতি নজর রাখতে অনুরোধ জানাই।